‘পূর্ণিমা’ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে...

ছিট কাপড়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আনিসুর রহমানের মা যখন ধরেই নিয়েছিল যে তার ছেলের বৌ শাহানা বেগমের ঘরে বংশের প্রদীপ জালানোর জন্য একটি পুত্র সন্তান আবশ্যক ঠিক তখনই জন্ম হয় পূর্ণিমার। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় কতইনা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় মা শাহানা বেগমকে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেই সব কষ্ট ভুলে যেতেন তিনি। চাঁদের মত ফুটফুটে হওয়ায় নানী তার নাম রাখে ‘পূর্ণিমা’। ধীরে ধীরে পূর্ণিমা অবহেলায় বড় হতে থাকে আর বুঝতে থাকে সে এই পৃথিবীতে অপ্রত্যাশিত - কারণ সে মেয়ে। তার ভাইয়ের মত স্কুলে যাওয়ার অধিকার তার নেই - কারণ সে মেয়ে। মা শাহানা কিছুটা শিক্ষিত হওয়ায় ঘরে বসেই পড়া শিখতে থাকে পূর্ণিমা। পড়াতে গিয়ে মা আবিষ্কার করে পূর্ণিমার অসাধারণ প্রতিভা - একদমে বইয়ের সবগুলো ছড়া শুনিয়ে সবাইকে তাঁক লাগিয়ে দিত পূর্ণিমা।

শাহানা বেগম বেশ কিছুদিন থেকেই এনডিপির ফুলকলি সমিতির সভাপতি। এনডি-পির ক্ষুদ্র ঋণের টাকায় সেলাই মেশিন কিনে বেশ ভালই আয় করেন তিনি। সমিতির সভাপতি হওয়ায় অনেকের উপকার করার সুযোগ হয় তার। তাই সবাই তাকে ভালবাসে ও সুপরামর্শ দেয়। মেয়ের প্রতিভার কথা শুনে সবাই পূর্ণিমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিস্তির স্যারও তাই বলেছিল। অবশেষে স্কুলে ভর্তি হয় পূর্ণিমা। ২০১২ সালে সয়াধানগড়া দক্ষিণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ পায় সে। ঠিক এমনই এক আনন্দঘন মুহূর্তে আনিসুর রহমান একটি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। সেই সাথে স্বামীর উপার্জন ও বন্ধ হয়ে গেল। কি করবে ভেবে কূল পায় না শাহানা। ছোট ছেলেটাকে সাইফুল সুজ নামের এক জুতার দোকানে কাজে দেয়। মেয়েটা দেখতে শুনতে ভাল। কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দেয় মেয়ের বিয়ে দিতে। ভাল ভাল সম্বন্ধও আসে বেশ কয়েকটা। কিন্তু পূর্ণিমাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। পূর্ণিমা তার মাকে বলে, “আমাকে নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি বাড়ী-বাড়ী কাজ করে নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালাবো। স্কুলের স্যার বলেছে ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে। তুমি কি তোমার মেয়ে কে মেরে ফেলতে চাও? স্কুলে গেলে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি আরও পড়ালেখা করতে চাই মা।” মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে শাহানা ঠিক করল যেকরেই হোক সে তার মেয়েকে হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিবে। তার পর থেকেই সে খুঁজতে থাকে কিভাবে মেয়ের পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়ার জন্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। এমনি একদিন এনডিপির কিস্তির স্যার বাসায় এসে এনডিপির শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে জানায়। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। সেই দিনই শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করে পূর্ণিমা। অবশেষে প্রতীক্ষার ক্ষণ শেষ হয়। শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনিত হয় সে। এবার শুধুই স্বপ্ন পূরণের পালা। পূর্ণিমা ভর্তি হয় ডঃ নওশের আলী গার্লস হাই স্কুলে। ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে সে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে আসছে যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যহত থাকবে। জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল ভাল হলে তার জন্য অপেক্ষা করছে আরও ৩ বছর ব্যাপী একটি বৃত্তি যার পরিমাণ হবে মাসে ৫০০ টাকা। তাই পূর্ণিমাকে ভাল ফলাফল করতেই হবে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনীতে পরীক্ষার ফলাফল তার বেশ ভাল। এবার ৮ম শ্রেনীতে সে অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে লেখাপড়া করছে। নিজের মেয়ের গুণের কথা বলতে গিয়ে মা শাহানা আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়। সদাচারী, বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল আর পরিশ্রমী পূর্ণিমা শুধু আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীরই মন কাড়েনি বরং শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের ও হৃদয় ছুয়েছে। বাল্য বিবাহের অভিশাপ থেকে তার কয়েটি বান্ধবীকে মুক্ত করতে পূর্ণিমা রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা। কারও কোন বিপদে আপদে তাকে কাছে পাওয়া যায়। পূর্ণিমার স্বপ্ন সে বড় হয়ে ডেরিকা হবে।